মহাশ্বেতার আখ্যানবিশ্বে রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার চিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত। তাঁর রচিত প্রায় প্রত্যেকটি রচনার মধ্যেই রয়েছেরাজনৈতিক বাস্তবতার চুলচেরা বিশ্লেষণ। কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও পরোক্ষ। তবে তাঁর সাহিত্যের মূল বিষয়ই হচ্ছে প্রতিবাদকে স্বতন্ত্র মাত্রা দান করা। আর এই প্রতিবাদ মানেই হচ্ছে আধিপত্ত স্থাপনকারী ব্যক্তি বর্গের ক্ষমতা বা প্রতাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত মানুষ সাধারণ নিম্নশ্রেণির দরিদ্রসীমার নিম্নে বসবাসকারী মানুষকে সর্বদা শাসন, শোষণ ও নিয়ন্ত্রন করে আসছে। এই ক্ষমতার হাতিয়ার এতটাই সুকৌশলে প্রয়োগ করা হয় যে, অনাহারক্লিষ্ট নিরন্ন অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণির সাধারণ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষেরা বুঝতে পর্যন্ত পারে না। আর এর ফল স্বরূপই বুদ্ধিবৃত্তিক সাংস্কৃতিক ক্ষমতা প্রতিনিয়ত এসে বর্তায় খেটে খাওয়া সাধারণ গরীব শ্রেণির মানুষ গুলির উপর। একারনেই এই মানুষেরা মানুষ হলেও মানুষের মতো জীবন যাপন করতে পারে না।

সময়ের আবহে পরিস্থিতির শিক্ষায় নিম্নশ্রেণির শোষিত মানুষেরা যখন বুঝতে পারে তখনই নির্মান হয় নিয়ন্ত্রন, শোষণ, শাসন, নির্যাতন ও ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ নির্মান করাই মহাশ্বেতার সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেননা এযাবৎ কাল সমাজ ও সংস্কৃতিতে নিম্নশ্রেণির মানুষেরা যেভাবে শোষণ, শাসন, নির্যাতন হয়েছে এবং তার প্রতিবাদ নির্মিত হয়েছে সেই রাজনৈতিক বাস্তবতার রূপটিই ফুটে ওঠে তার আখ্যানবিশ্বে। মহাশ্বেতার প্রায় প্রত্যেকটি গল্প ও উপন্যাসে প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয়। কেননা অনর্থক কাহিনি বর্ণনা করা মহাশ্বেতার চরিত্রগত বৈশিষ্টে নেই। তাইতো গোটা সমাজে রাজনৈতিক শোষণ ও নির্যাতন যেভাবে প্রতিনিয়ত বিস্থারিত হয়ে চলেছে সেই রাজনৈতিক বাস্তবতার চিত্রই ফুটে ওঠে মহাশ্বেতার সাহিত্যে। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক প্রফুল্য রায়ের মন্তব্যটি প্রনিধান যোগ্য,

> "মহাশ্বেতা দেবীর মতো এমন বহু বর্ণময় লেখিকা বাংলা সাহিত্যে আর কেউ আছেন বলে আমার জানা নেই। জেদি, অপ্রতিরোধ্য, প্রতিবাদী এই মানুষটির বিপুল অভিজ্ঞতা।

> সামান্য কয়েকটি কথায় তাঁর রচনা সমগ্রের বিশাল ব্যপ্তি এবং গভীরতা সম্পর্কে কতটুকুই বা বলা যায়? তার লেখায় দূর ও নিকট অতীতের ইতিহাস, বাংলা ও বিহারের ব্রাত্যজন, আদিবাসী বন্ধুয়া মজদুর, নাগরিক জীবনের জটিলতা, নানা রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যপক ভাবে ধরা পরেছে। আমাদের সৌভাগ্য লেখক হিসেবে তিনি এখনও সক্রিয়। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন শুধু বাংলা সাহিত্যকেই নয়, ভারতীয় সাহিত্যকেও ঋদ্ধ করে চলেছে।"[১]

যে কোন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সংস্কৃতি হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করার চূড়ান্ত শক্তি। আর সে কারনেই মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত নিম্নশ্রেণির মানুষ গুলোর সাংস্কৃতিক দিক গুলিকে সক্রিয় করে তুলার চেষ্টা করেণ। লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী একজন রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি। তাইতো সংস্কৃতিকে নিয়ে শোষণ পীড়নের খেলায় যেভাবে মেতে উঠেছে রাষ্ট্র, সেই খেলার বিপরীতে কলম তুলে ধরেন তিনি। রাজনীতির এই উপকরণ গুলি বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তৎসঙ্গে বিশ্লেষণ ও মাত্রাকেও বর্ণনা করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। যাতে সাধারণ দরিদ্র সীমা রেখার নিচে বসবাসকারী অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ বুঝতে পারে যে তাদের উপর রাজনীতির গ্যাড়াকলের চাপ কিভাবে বর্তায়। এবং ক্ষমতা বা প্রতাপের দ্বারা উচ্চবর্ণের মানুষেরা কীভাবে তাদের রাজনৈতিক বেড়াজালকে বর্ধিত করতে থাকে বসবাসকারী সাধারণ নিম্নবিত্তের মানুষদের চতুর্দিকে। ভূমিহীন, জমিহীন, জলহীন কৃতদাস, ভূমিদাস প্রভৃতি সাধারণ মানুষদের নিয়ে আসে নিজের কুক্ষিগত। আর এই অসহায় শ্রেণির খেটে খাওয়া মেহনতি করা মানুষ গুলোকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখার জন্য নির্মান করে নিত্য নতুন সুকৌশলি বহু বিধি বিধানের। এই জায়গায় এসে মহাশ্বেতার দৃষ্টি চক্ষুর সুপ্রসংসা না করে উপায় নেই। কেননা গোটা সমাজ যখন অন্ত্যজ সম্প্রদায় ভুক্ত আদিবাসী মানুষ গুলোকে একেবারে বঞ্চিত করে, এবং প্রথাগত ধারা বাহিক ভাবে চলে আসা সাহিত্য রচনায় মনোযোগ দেয়। সেই আধুনিকোত্তর

সময়ে মহাশ্বেতা নিজের সংস্কৃতি ও অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলা আদিবাসী সমাজকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাড়িতে এনে দাঁড় করিয়ে দেন। আজ আমাদেরকে স্বীকার করতেই হয় যে মহাশ্বেতা না হলে এই আদিবাসী সম্প্রদায়কে আমরা অনেকেই চিনতেই পারতাম না। অপরদিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এই অন্ধকার দিকটিকে প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোকিত করেছেন লেখিকা। তাই অনগ্রসর, নিম্ন, অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের ইতিহাসও একটা পূর্ণ রূপ নিয়ে উঠে আসে আমাদের কাছে। যাদের ইতিহাস আছে বলে আমরা অনেকেই জানতাম না। একজন বুদ্ধিজীবি সমাজ সেবীর যে ভূমিকা হওয়া উচিৎ তা মহাশ্বেতার লেখায় পরিপূর্ণ সাক্ষরিত।

মহাশ্বেতার লেখায় শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট রাজনীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায় না। রাজনীতির বহুধাবিস্তৃত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দিক গুলিকে লক্ষ করা যায়। মহাশ্বেতা নিজেও সে কথাই উল্লেখ করেছেন,

> "আমার লেখায় চিহ্নিত রাজনীতি খোঁজা নিরর্থক। শোষিত ও নির্যাতীত মানুষ, তাদের প্রতি সংবেদি মানুষ আমার লেখায় প্রধান ভূমিকা। ..... অন্ন, জল, জমি, ঋন, বেঠ বেগারী কোনটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন শুভ্র ও সূর্য সমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরনা। দক্ষিনে বামে সকল দলই সাধারণ মানুষকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আমার জীবন কালে এ বিশ্বাস বদলাবার কারন ঘটবে আশা নেই তাই সাধ্যমত মানুষের কথাই লিখে গেলাম, নিজের মুখোমুখি হতে যেন লজ্জা না পাই সে জন্যে।"[২]

সমাজ সচেতন শিল্পী মহাশ্বেতা সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। আর এই দায় বদ্ধতার কারণেই নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন নিজের ঘারে। লেখিকা নিজেও একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমি সারা জীবন সেই ইতিহাসেরই অনুসন্ধান করছি।..... মাঝখানের খালি জায়গা টুকু, যেখানে লোকবৃত্তের ইতিহাস আছে।, তাকে খুঁজে বের করি।'[৩] এই খুঁজে বের করে ইতিহাস রচনার দিক থেকে মহাশ্বেতা পরিপূর্ণ সার্থক। তাঁর ইতিহাস মানেই হতদরিদ্র মানুষের জীবনালেখ্যের অর্থ অন্বেষণ। এই অন্বেষণের মধ্যদিয়ে আদিবাসী অন্ত্যেবাসী দরিদ্র মানুষদের গোটা জীবনকে যেন দুহাতে উঠিয়ে নিয়ে এসে সাহিত্যের অঙ্গনে নতুন ডাইমেনশনে বসিয়ে দিয়েছেন।

বিভিন্ন সময়ে যাঁদের পর্যটন অভিমত, বহুমান্য বাস্তবকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের যে ইতিহাসকে দেখানো হয়েছে তা ভারতবর্ষের প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ অবস্থা নয়। প্রকৃত অবস্থাটাকে দেখানো হয়েছে আংশিকভাবে। প্রকৃত ইতিহাসকে সড়িয়ে রাখা হয়েছে। যারা আলো থেকে অনেক দূরে বাস করে, যারা কোনদিনই প্রত্যক্ষ আলোর সামনে আসতে পারেনি, শহর থেকে অনেক দূরে বাস করেও শহুরে শোষণ থেকে মুক্তি পায়নি তাদেরকে ভারতীয় ইতিহাসে স্থান দেওয়া হয়নি। অথচ তারাই হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রকৃত মানুষ। তাদের জীবন চর্চা, সংস্কৃতি, জীবিকা, প্রভৃতিই হচ্ছে আসল ইতিহাস। মহাশ্বেতা দেবী এই মেকি ইতিহাসের যবনিকা ঘটিয়ে বঞ্চিত বর্জিত ইতিহাসকে পুনর্নিমান করেন। কেননা তিনি লোকবৃত্তের মধ্যেই জীবন বিবর্তনের তাৎপর্য খোঁজেন।

ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রাবল্যের কূটকৌশলে যাদের আপন সংস্কৃতির সবকিছুই মূল স্রোতের অধিন হয়ে যায়, মহাশ্বেতার আজীবন প্রয়াস সেই সাংস্কৃতিক রাজনীতির খোলশটিকে খুলে দিয়ে প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠা, বিকল্প বাস্তবের নির্মান। এই ক্ষমতার রসি ধরে টান মেরেছেন মহাশ্বেতা এবং দেখাতে চেয়েছেন ক্ষমতার অপব্যবহার কীভাবে হয়। সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার মুখোসটাকে খুলে ফেলে দেখিয়ে দিয়েছেন নামমাত্র অস্তিত্বের গণতান্ত্রিক সরকার দ্বারা কিভাবে লাঞ্ছিত হয় সাধারণ নিম্নশ্রেণির মানুষেরা। এই প্রসঙ্গে মহাশ্বেতার একটি অনু উপন্যাস বা বড় গল্পের কথা 'তিনকন্যা' সংক্ষেপে বলা যেতে পারে।

এই অনু উপন্যাসে মহাশ্বেতা নন্দী গ্রামের রক্তক্ষয়ী মর্মস্পর্শী আগুন ঝরা রাজনীতির (২০০৭ সালের) বাস্তব রূপটিকে তুলে ধরেছেন।

নন্দীগ্রামের তিনজন নারী নন্দরানী, চন্ননী এবং বাসনা বালা, রাজনৈতিক গ্যাড়াকলের চাপে তারা তিনজনই ধর্ষিত। নন্দরানীর স্বামী দুলালকে পার্টির ছেলেরা খুন করেছে। তাদের ছেলে মেয়েরা অসহায় হয়ে বুড়ো দিদার কাছে আশ্রয় নেয়। বত্রিশ বছর বয়সী নন্দরানি পাড়ার ছেলে পার্থর কাছে হয় ধর্ষিত। পার্থ সরকার নকুল সামন্তের পার্টির হার্মাদ। তাইতো দেবর বৌঠানের মতো পবিত্র সম্পর্ককে বিনষ্ট করে পার্থ হয়ে ওঠে শয়তান, গুন্ডা এবং নিসংস ধর্ষক।

চন্ননী স্বামী পরিত্যাক্তা, অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে জীবন ধারন করে। নিজের জমি টুকু নকুল সামন্তের পার্টিতে দিতে রাজী না হওয়ায় তাকে খাটের তলা থেকে টেনে বের করে ধর্ষণ করে পার্টির গুন্ডা দেবরাজ জানা। অথচ এদের বিরুদ্ধে কোন এফ. আই. আর নেয় না থানা পুলিশ। কোনদিন গ্রেপ্তার করতেও আসে না।

বাসনাবালা ধর্ষিত হয়নি, সে প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু হৃদয়ের মর্মস্থলে অন্তর্বেদনায় দগ্ধ হয়েছে প্রতিনিয়ত। তার মনে প্রশ্ন জাগে 'যতগুলো মেয়ে ইজ্জত হারাল তারাও গ্রামে থাকবে আবার যারা ইজ্জত নিল তারাও গ্রামে থাকবে।' প্রশ্নজাগে মনে ভারত গনতান্ত্রিক দেশ। এই দেশের একটি সংবিধান আছে যা সকলেই মান্যতা দেয়। এই দেশে অপরাধীর শাস্তি অনিবার্য। কিন্তু এ সব কিছুই শুধুমাত্র সাংবিধানিক খাতার পাতাতেই সত্য থাকে বাস্তবে প্রয়োগ হয় না। বিশেষ করে নিম্ন শ্রেণির ভিটে মাটি হীন স্বজনহীন অসহায় মানুষদের ক্ষেত্রে তো না-ই। সংসয় থেকে যায় সত্যি কি সমাজ পরিবর্তন হয়েছে!

যদি হয়েও থাকে তবে কেন এই খুন, ধর্ষণ, বৈষম্য, যেখানে ক্ষুধার নিমিত্তের কারনে যশোদাদের স্নেহ, মাতৃত্বকে পন্য করতে হয়। অনাহারক্লিষ্ট জীবন যাপন করতে হয় শনিচরীদের। ধর্ষিত হতে হয় শত শত আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত নারীদের। একই দেশ বা রাষ্ট্রে বসবাস করার সত্বেও দেখা দেয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য। এই সব কিছুই বাস্তব সত্য কিন্তু এই সত্য ইতিহাস মহাশ্বেতার আগে কেউ লিখে যাননি। প্রশ্ন জাগতেই পারে এই নিম্ন অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের লড়াই কি লড়াই নয়! এরাও তো প্রতিদিনকার মাথাপিছু প্রকৃত আয় থেকে সড়ে গিয়ে নিজের চাহিদা পুরণের পরিবর্তে নিজের উপার্জনকে তুলে দিচ্ছে অন্যের মুখে। বিনা বস্ত্রে, খাদ্যে, বাসস্থানে জীবন যাপন করছে। অথচ এরাও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মুক্তি যোদ্ধা। মহাশ্বেতা এই পিছনের সাড়িতে থাকা বঞ্চিত অবহেলিত ও শোষিত জনের ইতিহাসকেই রচনা করে গেছেন। সে কারনে বলতে হয়, বাস্তব জগতের মূল শেকড় থেকে উঠে আসে মহাশ্বেতার সাহিত্য। আর এরই মধ্যে জড়িয়ে থাকে সাধারণ মানুষের গোটা জীবন পরিধি, ইতিহাস, আন্দোলন, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, সংঘাত প্রভৃতি সমস্ত বিষয়। তাইতো অনুন্নত নিম্নশ্রেণির ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে লেখিকা বলেন,

> "ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উপজাতিদের ইতিহাসকে একটি ধারা হিসেবে মানা হয়নি। (আমি ভূমিপুত্র বা আদিবাসী না বলে 'উপজাতি' কথাটি ব্যবহার করেছি, কারন ভারতের প্রেক্ষাপটে এই কথাটিই যথার্থ) সেই অবস্থা এখনও চলছে। উপজাতিরা এখনও তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে।"[৩][গল্পসরণি, ষোড়শ বর্ষ, বার্ষিক সংকলন১৪১৮, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, পৃ-৩৭৭]

ইতিহাস মানে শুধু রাজা মহারাজা বা ক্ষমতাশীল কাহিনি বর্ণনাই নয়। সঙ্গে সমস্ত নাগরিকের জীবন যাপন প্রনালী, তাদের অবস্থা - অনাবস্থাও ইতিহাস। 'ভূমিপুত্র'র পরিবর্তে উপজাতি 'শব্দ' ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে কারন দর্শনে তা প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক তাৎপর্যই নিয়ে আসে। ভূমিপত্র হয়েও যারা অস্তিত্বের সূত্রে সেই আখ্যা পায় না, 'উপজাতি' হিসেবেই স্বীকৃত, তাদের এই সংকটকেই তো তিনি আজীবন সামনে আনতে চেয়েছেন। কোনো ধরণের স্তোকবাক্যে ঢেকে দিয়ে তাদের অস্তিত্ব জনিত অনিশ্চয়তাকে ঢাকতে চাননি।

ক্ষমতার বিভাজন কিভাবে কেন্দ্র-প্রান্তেও মেরু বদল ঘটায়, মহাশ্বেতার লিখন শৈলি সেই চিত্রটিকেই তুলে এনেছে কার্নিভাল প্রক্রিয়ায়। কেন্দ্র-প্রান্ত এবং প্রান্ত-কেন্দ্রর স্থান বদল ঘটেছে। তাঁর সাহিত্যে উভয় পৃথিবীরই বাস্তব রূপ ফুটে ওঠে। ফুটে ওঠে উভয়েরই জীবন যাপন প্রনালী, তাদের সম্পর্কের গভীর টানাপোড়েন। দেখা যায় সম্পর্কের তিক্তভাব। শাসিতের শোষণে সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের সংকীর্ণতা।

লেখিকা মহাশ্বেতা ক্রিতদাস সম্পর্কিত একটি মন্তব্যে বলেছিলেন,

> "একটা গ্রাম দেখেছিলাম যেখানে প্রচুর বন্ডেড লেবার ছিল। সিমড়া গ্রাম(পালামৌ)। ঐ সব ক্রীতদাসদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল পাহাড়ে। চাষ করতে দিয়েছে ব্যারেন ল্যান্ড। একজায় দেখলাম কুয়ো কাটা হচ্ছে- দুটো বছর চৌদ্দর ছেলে। জিজ্ঞেস করে জানলাম ওরা বন্ধুয়া মজদুর বন্ডেড লেবার। ওদের কোন স্বাধীনতা ছিল না।"[৪]

এই প্রথাকেই অনুসড়ন করে মহাশ্বেতা যেমন লিখেছেন 'আজীর' তেমনি আবার রচনা করেছেন 'এম.ডব্লু. বনাম লখিন্দ', 'অপারেশন! বসাই টুডু', 'চিন্তা', 'চরন দাসী', 'জল', 'দ্রৌপদী', 'স্তনদায়িনী', 'রুদালী', 'ডাইনী', 'বাঁয়েন' প্রভৃতি গল্প গুলি। যেখানে শ্রেণিগত বৈষম্যের কারণে ভাতুয়া, মাহিন্দার, বারোমাসিয়া, বাগাল, হুলিয়া, কামিয়া, ইজভা, চেরুমা, পুলেইয়া প্রভৃতি প্রথার দ্বারা ক্ষমতা ও প্রতাপের মাধ্যমে শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতনের দিকটিকেই উল্লেখ করেছেন মহাশ্বেতা। এই প্রসঙ্গেও উল্লেখ করতে হয় মহাশ্বেতার নিজস্ব বাচন,

> "ইতিহাস পাঠে আমার অনুরাগ এবং ব্যপ্তি চির দিনই ছিল, তারপর জীবন থেকে পাঠ নেওয়া শুরু হল, যা আমার লেখায় মূল ধারয়িত্রী সূত্র। হ্যাঁ ইতিহাস চেতনাই আমার সমস্ত লেখাকে ধারণ করে আছে। আর সেই জন্য তথ্য নির্ভরতার প্রয়োজন আমার কাছে খুব বেশি। আমার প্রথম

> বই যেমন 'ঝাঁসির রানী', প্রথম উপন্যাস 'নটী'(১৯৫৭), তেমনি 'আধারমানিক', 'অমৃত সঞ্চয়', 'কবি বন্দ্যঘটি গাঞির জীবন ও মৃত্যু', 'বিবেগ বিদায় পালা', এমনকি এই কালের পটভূমিতে 'জল' ও 'স্তনদায়িনী' লেখার জন্য আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি, ব্যবহার করেছি। আমার লেখা যদি কেউ গুরুত্ব সহকারে পরেন, আমি মনে করি তাকে জমি, ভূমি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে সমাজ ব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভাষা শোষক ও শোষিতের মধ্যবর্তী অনেক শাখা প্রশাখার উপস্থিতি এ সব কিছুই জানতে হবে।"[৫]

আর সে কারনেই আমরা 'স্তনদায়িনী' গল্পে দেখতে পাই সমাজ বাস্তবতার সেই চরম রূপটিকে, যা ক্ষুধার বাস্তবতায় উঠে এসেছে। এই খিদের জ্বালা যে কত বড় বাস্তব হতে পারে তা বুঝে দেওয়ার জন্য যশোদা মাতৃত্বকে পর্যন্ত জীবিকা হিসেবে গ্রহন করেছে। যশোদার স্বামী কাঙালী পঙ্গু হলেও শুধুমাত্র পৌরুষত্বের বলে দ্বিতীয় বিবাহ করে সুখে জীবন যাপন করে, যশোদাকে ত্যাগ করে। এই ঘটনাও তো বর্তমানে প্রতি নিয়ত ঘটে চলেছে সমাজ সংসারে। কেননা সমাজে এখনও এমন বহু পুরুষ রয়েছেন যারা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার পর্যন্ত বিবাহ করেন প্রথম স্ত্রী জীবিত ও একই পরিবারে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও। যে ক্যান্সার রোগে যশোদার মৃত্যু হয় এই ক্যান্সার রোগকে মহাশ্বেতা দেখিয়েছেন বাস্তব সামাজিক এক ব্যধি রূপে। এই সামাজিক ব্যধির ভয়াবহতাও মহাশ্বেতা সমাজ থেকেই সংগ্রহ করেছেন সদাসয় ডাক্তার টম চৌধুরির কাছ থেকে। মহাশ্বেতা যশোদার কাহিনি যে বাস্তব সমাজ থেকেই সংগ্রহ করেছেন সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন,

> "সংরক্ষণ থেকে 'স্তনদায়িনী' প্রত্যেকটিকে আমি যা ঘটে আসছে ভয়ঙ্কর একই রকম ভাবে প্রাচীন দিন থেকে আজ এবং আগামী শতকেও সে কথাই লিখেছি।.....
>
> 'স্তনদায়িনী'র যশোদাকে পশ্চিমবঙ্গ বলে মনে করে লিখেছি। যদিও স্তন ক্যান্সারের ব্যপারটি সাধ্য মতো জেনে নিই

সদাশয় ডাক্তার টম চৌধুরীর সহায়তায়। অবশ্যই মেডিক্যাল ডিকশনারীও ছিল।.....

'স্তনদায়িনীর' যশোদাকে ছমাস আগে বাস্তবে জানলাম। সে সাত বাড়ি ঝিঁ খেটে নিজের ও সতীনের সন্তানের পাল, সতীন অপদার্থ স্বামী, সকলের অন্ন যুগিয়ে যাচ্ছে, নিজে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, বাস্তবতার এমন ভিত্তি খুজে পেয়ে অমার অবাস্তব লেগেছিল।"[৬]

মহাশ্বেতা সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার একটি পূর্ণচিত্র স্তনদায়িনীতে উল্লেখ করেছেন। প্রয়োজনে যশোদা হয় হালদারদের দুধ মা, প্রয়োজন ফুরালে হয় অপরিচিতা ও বিতাড়িতা। উচ্চশ্রেণির মানুষের সামাজিক শোষণ ও শাসন করার সুকৌশলী রাজনীতির এক অন্যতম মাধ্যম। যশোদার স্বামী কাঙালীর যশোদাকে ত্যাগ করা এবং দ্বিতীয় বিবাহ করার মধ্যদিয়ে পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যাবস্থার আধিপত্য বিস্থারের দিকটি ফুটে ওঠে। যশোদা এখানে শোষিত, শাসিত, ও নির্যাতীত আবার স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্যের মধুময় সম্পর্কের অজুহাতে যশোদা যেন প্রতিনিয়ত হয়েছে ধর্ষিত। তা যদি না হয় তবে যশোদার এমন করুন অন্তিম পরিনতি কেন? আর এ কারনেই বোধয় মহাশ্বেতা এক শিল্প সম্মত শৈল্পিক প্রতিবাদ নির্মান করেন যশোদার প্রতি শোষণ, শাসন, ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে। অবশ্য মহাশ্বেতা গল্প লিখবেন আর সেখানে প্রতিবাদ থাকবে না তা হয় না। কেননা প্রতিবাদহীন গল্প মহাশ্বেতা লেখেন না। তাই তো পরাপাঠের মধ্যদিয়ে সমস্ত সীমা পেড়িয়ে গিয়ে অর্থকে করেছেন তাৎপর্যবহ। যেখানে আপাত দৃষ্টিতে কোন প্রতিবাদ নেই সেখানেই লেখিকা এগিয়ে গিয়ে প্রতিবাদের স্বর নির্মান করেছেন। এখানে যশোদার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। রাজনৈতিক সচেতনতা, প্রতাপের দ্বারা শোষণ এবং সেই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে মহাশ্বেতা পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছে। গল্পের চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে বিলীন করেছে আর সে কারণেই চরিত্রের প্রতি হওয়া নির্যাতনের প্রতিবাদের দায়িত্ব তুলে নেন নিজের ঘারে। আর সে জন্য স্পষ্ট এক প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর পাঠকবর্গ শুনতে পান। যা মূলত প্রতিবাদী এক নারী সত্ত্বার মূল তাৎপর্যেরই এক অর্থবহ রূপ।

মহাশ্বেতার সাহিত্য সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে কতটা প্রভাব ফেলেছে সে সম্পর্কে বলা কিছু প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, গল্পকার এবং সমালোচকদের মন্তব্য গুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ করার মতো।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

> "মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য উপন্যাস ক্ষেত্রে নবাগতা হইয়াও নারী রচিত উপন্যাসের পরিধি ও বিষয় বৈচিত্রকে আশ্চর্যভাবে বাড়াইয়া দিয়াছেন। তাহার জীবন অভিজ্ঞতা যেমন বিচিত্র পথগাম্য, তাহার রূপায়ন দক্ষতাও সেই রূপ বিশ্ময়কর। সাধারণত নারীর জীবন বীক্ষণে যে একটি সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা দেখা যায় পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচিত ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতি একান্ত ও অব্যবহিত মনোযোগ লক্ষিত হয়, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য তাহাকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া নানা নতুন পথে, অভিজ্ঞতার অভ্যস্থ নৈপুন্যের সহিত স্বচ্ছন্দ বিচরণ করিয়াছেন ও নানা অপরিচিত জীবন যাত্রার ধারা আমাদের নিকট উদঘাটন করিয়াছেন। তিনি জীবন দর্শনের একটি অভিনব সংজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি লইয়া আমাদের জীবন বোধকে যেমন উচ্চকিত, তেমনি পরিতৃপ্তও করিয়াছেন।"[৭]

অমর মিত্রের মতে,

> "…. এখন নাকি সবদিনই পূর্ণিমা। এও তো দ্রৌপদী মেঝেনকে ভুলে থাকার ছল। তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতি,

সতীনাথ ভাদুরীর উত্তোরাধিকার নিয়ে এসে মহাশ্বেতা নিজেই একটা ধারা। তার কোন পূর্বসূরী আছে কি? আগে কখনও ছিল জগোমোহনের মৃত্যু, দ্রৌপদীর অপারেশন, বসাই টুডু লেখার কথা ভাবা হয়েছিল? অরন্যের অধিকার নিয়ে সরব হয়েছিলেন কোন লেখক? আগে কখনোকি দ্রৌপদী মেঝেনরা ভারতীয় সাহিত্যে এমন রক্ত মাংস নিয়ে এসেছে? নিরন্ন ভূমিহীন চাষি বসাই টুডুকে আমরা দেখতে পেয়েছি কি, মহাশ্বেতা যেভাবে তাঁদের এঁকেছেন। দ্রৌপদী রুখে দাঁড়ায়, বসাই টুডু বার বার মরেও বেঁচে ওঠে, জমির আন্দোলনে সরব হয়। .....

মহাশ্বেতা দির লেখা সব অর্থেই রাজনৈতিক। যে সময়ের উপর দাঁড়িয়ে তার প্রবল উত্থান, সেই সময় পার হয়ে এসেছি আমরা অনেকদিন। কিন্তু এখনও যে তাকে ঘুরে ঘুরে পরতে হয় তার কারণ তাঁর রাজনীতি দলিয় রাজনীতি নয়। যে প্রত্যয় সমস্ত অন্যায়ের বিপক্ষে দাঁড়াতে শাহস যোগায়। সেই প্রত্যয়ের কথাই লিখেছেন তিনি বার বার।

আমরা যারা গত শতাব্দীর উত্তর দশকে লিখতে আরম্ভ করি, আমাদের সামনে মহাশ্বেতাদিই ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন সব চেয়ে বড় শক্তি।”[৮]

নিতাই বসুর মতে,

“ইতিহাস মহাশ্বেতার সাহিত্য জীবনের প্রথমাবধি প্রিয় প্রসঙ্গ, মূল বিষয়। তিনি কিন্তু ইতিহাস বলতেবোঝেন না রাজা-রাজরা দের বিবাদ লড়াই, সাফল্য বা ব্যর্থতা। বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস লেখায় তার বিন্দু

মাত্র আগ্রহ নেই। তিনি মনে করেন, ইতিহাস চর্চা যেকোন সৎ সাহিত্যিকের পক্ষে আবশ্যিক। ইতিহাসের ধারায় শিক্ষিত হতে গেলে একজন বিবেকবান শিল্পিকে জানতে হবে সেই অঞ্চলের ভুগোলকে, সমগ্র মানব সমাজকে, তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলকে। এর জন্য অবশ্যই প্রয়োজন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, ত্যাগ ও অনুশীলন। যে কোন প্রকার গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাস চর্চার পক্ষে অবশ্যই পরিহার্য।"[৯]

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর মতে,

"আমাদের সামনে কোন সাহিত্যিক মডেল ছিল না। এমনকি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নন। মহাশ্বেতার লেখা আবিস্কার করেছি কিছু পরে। কিন্তু সমালোচকদের অনেকেই আমাদের অনেকের লেখায় মহাশ্বেতার প্রভাব আবিস্কার করতেন। লজ্জিত হতাম না, গর্বিত হতাম। এখন বুঝতে পারি মহাশ্বেতার সময়টাকে যেভাবে খামচে ধরতেন, সময়ের বহিরঙ্গ নয় শুধু, অন্তরঙ্গ সহ তিনি সময়ের প্রতিনিধি হয়ে যান। সত্তুরের ওম পেয়ে বেড়ে ওঠা আমাদের ইন্দ্রিয় এবং অনুভূতি আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের কথাই বলেছেন মহাশ্বেতা দি।"[১০]

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

".....মহাশ্বেতা দেবী মোটামুটি ভাবে তার লেখক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনার জন্যই বিখ্যাত। একথা অবশ্যই ঠিক, এ পর্যায়ের মহাশ্বেতা এক নতুন চৈতন্যকে তার বিক্ষাগত

ভূমিতে আত্মিকৃত করেন। সমাজের উচ্চবর্গীয়, মধ্যস্তরের জগৎ থেকে তিনি আদিবাসী নিম্নবর্গীয় জগতে চলে আসেন। ষাটের দশকের শেষের দিক থেকে এ বঙ্গে যে এক স্বপ্নময় রাজনৈতিক উচ্চারণ মধ্যবিত্ত সত্তাকে নাড়া দেয়, সমাজের নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক তৃনমূল মানুষদের সম্পর্কে বিশেষ চেতনা নিয়ে আসে, মহাশ্বেতা সেই চেতনাকে নিজের 'সত্য' ভাবনায় অম্বিত করেন। একথা ভাবলে ভুল হবে, ঐ সময় মহাশ্বেতার বিক্ষাকে পাল্টে দেয়-আসলে লোক জীবনের প্রথম পর্যায়েই মহাশ্বেতা প্রচলিত উচ্চ বর্গীয়, ডমিনেন্ট সত্যর প্রতিবাদের সত্যকে বিক্ষাভুক্ত করেছিলেন, নতুন সময় তার ঐ সত্যকে আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে নিয়ে যায়।"[১১]

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের মতে,

"..... মহাশ্বেতা দেবী শুধু সময়কেই যে সঠিক উপলব্দি করেছিলেন তা নয়, তিনি বুঝে ছিলেন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যময় যে জন সমাজ, যাদের আমরা আদিবাসী জনগোষ্ঠি নামে চিহ্নিত করেছি, তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার মধ্যেই ভবিষ্যত মুক্তির দিশা লুকিয়ে আছে। ..... স্বর্ণ কুমারী, মানকুমারী, জ্যোতির্ময়ী, আশাপূর্ণা দেবী এবং পরবর্তী যুগেও বাংলা গল্প-উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি মহিলাদের অবদানে সমৃদ্ধ। তবুও পুরুষ শাসিত সমাজে সব কিছু স্বীকৃতির মধ্যেও কোথায় যেন অনুকম্পা অনুসংগ্রহ এবং মৃদু পিঠ চাপড়ানোর ব্যাপার প্রশংসার মধ্যে লক্ষ করি। মহাশ্বেতা দেবীই ছোকটাকে সম্পূর্ণ বদলে দিলেন। সদর্থে আধিপত্য বলতে যা বোঝায়, গত তিন দশক জুড়ে ভারতীয় সাহিত্যে তার পদচারনা আমাদের বিস্মিত করে। অটল,

অনড়, সংগ্রামী স্নায়ু তন্ত্র কতখানি দৃঢ় হলে এই সফলতা সম্ভব, ভাবলে বিস্ময় বোধ করি।”[১২]

Mulk Raj Anand এর মতে,

“She is the most important writer of India in the last 50 years..... Mahasweta goes beyond me right in to the tribal areas.”[১৩]

অভিজিৎ সেন বলেন,

“তাঁর লড়াইটা বহুমুখি।..... ভারতবর্ষের এক ক্রান্তি কালিন সময়ের অনুপুঙ্খ দলিল তৈরি করে রেখে যাচ্ছেন তিনি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সাহিত্য সাংবাদিকতা ও দলিলের আধারে। তিনি এই অস্থির সময়ের অনলশকাল পঞ্জিকার আশ্চর্য গতিশীল এবং বহতা মহাশ্বেতা সেই কাল ধরে মানুষের কথা লিখেছেন, মানুষের জন্য কাজ করেছেন। .....

সব প্রতিভাবান প্রতিভা সঙ্গে নিয়ে জন্মায় না।..... কিন্তু প্রতিভা কারো কারো কাছে এসে ধরাও দেয়। অনলস অভ্যাস, শিক্ষা, চর্চা, দীক্ষা, পরিশ্রম, একমুখি একটা একাগ্রতা যা শেষ পর্যন্ত প্রতিভার স্ফুরনে মুক্তি পায়। মহাশ্বেতা দেবীর সৃষ্টিশীলতা সেই একাগ্র সাধনার লব্ধ প্রতিভা, ক্রমাগত খাত কেটে নিজেকে তৈরি করা নদীর মতো বহতা।”[১৪]

শিবনারায়ন রায় বলেছেন,

> "বঞ্চিত ও অত্যাচারিত মানুষদের জন্য তিনি যেভাবে নিরলস সংগ্রাম করে আসছেন তার জন্যই তাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করি। একদা স্বদেশীর নাম করে এদেশের বাবুরা সম্পদ ও ক্ষমতার ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়ে ছিলেন, পরের প্রজন্মের বাবুরা বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে কমিউ নিজমের নাম করে যে যার গুছিয়ে নিয়েছেন এবং নিচ্ছেন, নিচের তলার শোষিত ও নির্যাতীত স্ত্রী-পুরুষ আজও ভাষাহীন অবহেলিত। এই পরিপ্রক্ষিতে মহাশ্বেতার বিবেকিতা ও ঐকান্তিক দায়বদ্ধতা বাঙালী বুদ্ধি জীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় তুলনা হীন। সমর সেনকে তাঁর শাহস এবং সত্য নিষ্ঠার জন্য শ্রদ্ধা করেছি; কিন্তু নিচের তলার স্ত্রী পুরুষদের সঙ্গে তিনিও মহাশ্বেতার মতো যুক্ত হতে পারেননি। যে সব শিক্ষিত তরুন তরুনিরা অগ্রজদের কথা বার্তা, আচার ব্যবহার দেখে হতোদ্যম ও অভিযন্তপ্ত মহাশ্বেতার অভিক মানবতা, তেজিত করুনা, জেদী বিবেকিতার সঙ্গে পরিচয় ঘটলে তারা হয়তো নিজেদের নির্ভেদ কাটিয়ে উঠতে পারবেন।"[১৫]

কিন্নর রায় বলেছেন,

> "ব্রতীদের অসম্পূর্ণ সংগ্রাম, যে সংগ্রাম কখনই ফুরোয় না তখন আবার নতুন করে বিহার, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম বাংলায় ঢেউ হয়ে দুলে ওঠে, তার পাশে মহাশ্বেতা দি দাঁড়িয়ে থাকেন। শুধু দাঁড়ান না, সহযোদ্ধা হয়ে যান। হাজারী বাগ, পালমৌ, গোয়া, গিরিডির বারুদ বন্দুক, রক্ত, মহুয়া

> ফল, বিড়ি পাতা তোলার সংগ্রাম কাহিনি আবার নতুন করে লেখা হতে থাকে ব্যালাড মহিমায়।
>
> হুল, উল গুলানের মরন নেই সংগ্রাম তো সত্যিই কখনো ফুরোয় না।”[১৬]

ইউ আর অনন্ত মুর্তির মতে,

> “মহাশ্বেতা দেবী মহান লেখিকা, তবে তাঁর ব্যক্তিত্ব আরও বড়। তিনি যা কিছু অন্যায় মনে করেন, তার প্রতিবাদ করেন। মহাশ্বেতা কৃষ আর আদিবাসী দের পক্ষে কথা বলেন। তিনি যেমন কথা বলেন, সেভাবেই জীবন যাপন করেন। তার শাহস অনুকরণীয়।”[১৭]

মহাশ্বেতার সমসাময়িক ও পরবর্তী সময়ের উপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিকদের উপরিউক্ত বক্তব্য থেকেও একটি বিষয় স্পষ্ট যে তিনি ছিলেন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলনে এক বিকল্প ধারার লেখক। যার ফলেই তাঁর সাহিত্যে সামাজিক রাজনীতির ক্ষমতা প্রয়োগ নীতিগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় মহাশ্বেতার ‘দৌলতি’ গল্পের কথা। যেখানে কামিয়া প্রথার নাম করে সাধারন নিম্ন শ্রেণির দরিদ্র মানুষদের শোষণ ও শাসন করার পদ্ধতি জারি করা হয়। সামান্য কয়েকটা টাকার বিনিময়ে সাধারন মানুষকে যে কিভাবে জমিদার, যোদ্দার মহাজনেরা নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসে তা মহাশ্বেতা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। গরীব, অনাহারে কষ্টে জীবন যাপন কারী আদিবাসী নাগরিকেরা কেউ ইচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় দাসত্ব জীবন গ্রহন করেনা। এই জীবন যাপনকে গ্রহন করতে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদেরকে বাধ্য করে উচ্চ শ্রেণির মানুষেরা। অপরদিকে একবার যদি কেউ জমিদারের বা জোতদার, মহাজনের ঋণ নিয়ে থাকে তাহলে জমিদার তাকে বাধ্য করে কামিয়ৌতি হতে। বংশ পরম্পরা অনুযায়ী কামিয়া থেকে যায় গরীব অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা। এই প্রথা থেকে পরবর্তী প্রজন্মেরও কেউ মুক্তি পায় না।

কেননা এই প্রথায় আবদ্ধ থাকা আর না থাকাতেই লুকিয়ে রয়েছে জমিদারের অর্থ উপার্জনের এক বড় মাধ্যম।

এই জোতদার, জমিদারেরা নিজের স্বার্থ এবং উপার্জনের উপর নির্ভর করেই নিত্য নতুন আইন প্রনয়ন করে। সরকার, প্রশাসন, সংবিধান এ সবকিছু মহাজনদের অর্থ ও ক্ষমতার কাছে গোলামে পরিনত হয়। আর এর ফল স্বরূপই এই শ্রেণির মানুষের লোভ লালসা চরমসীমাকেও অতিক্রম করে। অন্ত্যজ শ্রেণির আদিবাসী নারীদেরকে কামিয়ৌতি প্রথার জেরে নির্মান করে নিজস্ব প্রথাগত সাংবিধানিক রেন্ডিতে। দৌলতি, সোমনি, রেওতিকে অর্থবান পুরুষের মাংসল ক্ষুধা মেটাতে হয়। কেননা এই ক্ষুধা মেটানো আর না মেটানোতে লুকিয়ে রয়েছে পরমানন্দের অর্থ উপার্জনের মূল ভিত্তি। নারী পুরুষ সকলই কামিয়ৌতি প্রথার আবদ্ধে বন্দী হলেও নারীর ক্ষেত্রে যে নির্যাতনের চরম মাত্রাকে অতিক্রম করে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বস্তুত সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের সঙ্গে তার পরিবেশের ব্যাপক ও নৈব্যক্তিক এবং প্রবৃত্তি। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তির নান্দনিক ও ব্যবহারিক প্রকাশ। নান্দনিক প্রকাশ ঘটে শিল্প কলায় এবং সৌন্দর্য সৃষ্টিতে। ব্যবহারিক প্রকাশের মধ্যে থাকে সামাজিক সম্পর্ক, ভাষা, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং বিশ্বাস ঘটিত আচরণ প্রভৃতি। আর এর ফলেই ব্যক্তির ব্যক্তি স্বার্থপরতা এসে পরে। এবং বৈষম্যের সৃষ্টি হয় ক্ষমতায়, অর্থে এবং উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যে। দেখাদেয় শ্রেণিগত বৈষম্য। বিভক্ত হয় উচ্চ-মধ্য-নিম্ন শ্রেণিতে। আর এ সবকিছুই হয় অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলেই। উচ্চ শ্রেণির মানুষের দ্বারা শোষিত ও শাসিত হয় নিম্ন শ্রেণির মানুষ। এই শ্রেণিগত বৈষম্যের কারনে নারী শোসিত হয়। আবার শারীরিক গঠন ও পারিবাড়িক ক্রিয়াকর্মের বিভক্তের কারনে নারী শোসিত, শাসিত এবং নির্যাতীত হয়। তবে নারীকে শোষণ করা হয় তার সম্মতি আদায় করার মধ্যদিয়ে অর্থাৎ সুকৌশলে সাংস্কৃতিক রাজনীতি বা ক্ষমতা প্রতাপের মধ্যদিয়ে।

এই সাংস্কৃতিক রাজনীতির ক্ষমতা বা প্রতাপকে কাজে লাগিয়ে উচ্চ শ্রেণির মানুষেরা কামিয়া, সেউকিয়া, বেঠ বেগার প্রভৃতি প্রথা নির্মান করে এবং সাধারণ দরিদ্র অন্ত্যজ শ্রেণির আদিবাসী অন্ত্যেবাসী মানুষদেরকে শোষণ ও শাসন করে। তাদের জীবন, শরীর, কর্ম এবং উপার্জনকে ভোগ করে। আবার পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক রাজনীতির দ্বারা পুরুষ শাসন করে ও শোষণ করে নারীকে। এই বাস্তবতার স্বরূপ লক্ষ করা যায় 'বাঁয়েন' গল্পে।

এখানে এক নারীকে 'বাঁয়েন' বানিয়ে সমাজ চ্যুত করা হয়। সমাজের প্রান্তিকায়িত, অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণি তথা আদিবাসী সমাজে এই কুসংস্কার প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয় আজও। বাঁয়েন অপবাদ দিয়ে নিরালায় নির্জনে বসবাসের অনুপযোগী স্থানে বসবাস করাতে বাধ্য করে চন্ডী নামক এক 'মা' কে। আজও বহু জায়গায় ডাইনী অপবাদ দিয়ে দূর থেকে ইট কাঠ পাথর ছুড়ে মেরেফেলা হয়, জীবিত অবস্থায় পুরেও মারা হয়। মহাশ্বেতার 'বাঁয়েন' ও 'ডাইনী' গল্পের মধ্যদিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের এই বাস্তব দিকটিই ফুটে ওঠে। আবার একই সঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক রাজনীতির বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেননা এই 'বাঁয়েন' ও 'ডাইনী' প্রথাটির মধ্যদিয়ে নারীকে প্রান্তিকায়িত, অবহেলিত, বঞ্চিত এবং শোষণ করারই এক রাজনৈতিক পদ্ধতি লুকিয়ে রয়েছে। আর এই রাজনীতি থাকার কারনেই কুসংস্কার গুলি শুধু মাত্র নারীর অস্তিত্বের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে। লক্ষনীয় যে কোন পুরুষ এই কুসংস্কারের শিকার হয় না।

মহাশ্বেতার প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই সাংস্কৃতিক রাজনীতির কূটকৌশলকে সমাজ নিয়ন্তারা কাজে লাগিয়ে শোষণ ও নির্যাতনের সাম্রাজ্য চালিয়ে যায়, সে দিকটিই উল্লেখ করা হয়েছে। 'বাঁয়েন', 'ডাইনী', 'শনিচরী', 'ধৌলী', 'ইটের পরে ইট', 'দ্রৌপদী', 'স্তনদায়িনী', 'পদ্মিনী', 'রুদালী', 'বিছন', 'সংরক্ষণ', 'এম. ডব্লু বনাম লখিন্দ' প্রভৃতি গল্পগুলি ছাড়াও আরও বহুগল্পের মধ্যে। যেখানে রাজনীতির বিষয় গুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়।

লেখিকার রচিত সাহিত্যবিশ্ব যে বাস্তব সমাজ থেকেই সংগ্রহ করা তা তিনি নিজেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকা সাক্ষাৎকার এবং রচনা সমগ্রের ভূমিকা ও গ্রন্থ প্রসঙ্গ অধ্যায়ে লিখেছেন। নিচে তাঁর নিজের গল্প ও উপন্যাস প্রসঙ্গে উল্লেখ করা কিছু কথাকে তুলে ধরা হল,

> "সংরক্ষণ' থেকে 'স্তনদায়িনী' প্রত্যেকটিতে আমি যা ঘটে আসছে ভয়ঙ্কর একই রকম ভাবে, প্রাচীন দিন থেকে আজ এবং আগামী শতকেও সেই কথাই লিখেছি। শোষণ-নির্যাতন, প্রশাসনের মানুষ মারা খেলা, অরন্য-অরন্য প্রানী-অরন্য সন্তানদের মুছে ফেলা, সংস্কারের দাসত্ব, নারীর অবস্থান অতীতে যা ছিল, আজও তাই আছে। প্রতিবাদে জ্বলে ওঠা এ কাহিনীও নতুন কিছু নয়। আমার লেখার চরিত্রদের যেহেতু শ্রেণি হিসেবে দেখি, সেহেতু মনেকরি মেয়েদের বিপন্নতা, নারী মাংসের ব্যবসা, এসবই সত্য, ...। কখনো শুনি আমি বিপ্লবের প্রবক্তা। আমি কিছুই নয়। চুয়াত্তরে পৌঁছে যা সারসত্য উপলব্ধি করেছি আমি তাই লিখেছি, যা অনন্তকাল ইতিহাসে ঘটে এসেছে।"[১৮]

'সাঁঝ সকালের মা' গল্পের মুল ভিত্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন,-

> "..... সাঁঝ সকালের মা নামে একটি গল্প লিখে ছিলাম। তাতে দ্রব্যমূল্যে সসাগরা পৃথিবী দানের কথা ছিল। গল্পটি এমন ছিল, একটি নির্বোধ উদর সর্বস্ব মানুষ তার মাকে ভালোবাসে ও মা তার জীবনের সর্বস্ব। মা গুণিন, সারাদিন সেদেবী হয়ে থাকে। সন্ধ্যা ও সকালে ছেলে তাকে 'মা'

ডাকে। মা ভক্তের কাছে চাল নেয় ও সন্ধ্যায় ছেলেকে ভাত রেঁধে দেয়। মায়ের মৃত্যুতে ছেলে আঠারো টাকায় মা'কে সসাগরা ধারিত্রী দান করে কালী ঘাটে। কিন্তু শ্রাদ্ধের চাল সে কেঁড়ে নেয়। ভাঁত রাধবে সে ভাত খাবে। ভাতের গন্ধে সে মা'কে খুঁজে পায়। এই গল্পের সুতো পেয়েছিলাম এক অগ্রদানী পুরুতের কাছে। তিনি এক গরীব পরিবারকে বুঝাচ্ছিলেন, যে শ্রাদ্ধ করছো অনেক খরচ না করলেও চলে। সামান্য খরচেও স্বর্ণগাভী, রজত ও ভূমি দান করা চলে। তার কথাটি আমাকে গল্পটি লিখতে সুত্র দেয়।"[১৯]

'বাঁয়েন' ও অন্যান্য বেশ কয়েকটি গল্পের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন,

"'বাঁয়েন' কবে লেখা! (১৯৬৯) সেদিন এক মহিলা ডোমের খবর পড়লাম তাকেই চন্ডী দাসীর আপনজন মনে হল। 'দ্রৌপদী' লিখি ১৯৭৬ সালে। তারপর দ্রৌপদী থিমের কাছে সংস্কৃতি জগতের বার বার ফিরে যাওয়া দেখে ভালো লাগছে। স্তনকে কেন্দ্র করে আমি 'স্তনদায়িনী' লিখে সেদিনের বাঘ-সিংহদের প্রসংসা অনেক পাই, কিন্তু ঐ থিমতো ফিরে আসতে বাধ্য, নইলে 'চলিকা পিছে', লিখতাম না। .....

'শিশু', 'নুন', 'বিছন', ... একটি বিশেষ অঞ্চলকে নিয়ে লেখা। ঐ অঞ্চলটিকে আমি ভারতবর্ষ বলে মনে করি আর একই অঞ্চল বার বার ফিরে আসে। চরিত্র গুলির কাছেও তো দায়বদ্ধ।.....

বিছনের দোলনকে অন্যভাবে দেখে এলাম সেদিন। পুরুলিয়া ডুররুডিতে ধু-ধু বন্ধ্যা জমিতে বহু বৃক্ষ রোপনে সবুজ করে

এক কাঠের মাচা বেঁথে অশীতিপর সাগর শবর একা বসে পাহাড়া দিচ্ছে। ওকে যদি বলতাম, সাগর! তোর গল্প আমি লিখেছি ও বলতো, হ্যাঁ মা লিখেছিস!”[২০]

এছাড়াও মহাশ্বেতার আরও বহু গল্প ও উপন্যাসের ভূমিকা, উপসংহার, আত্ম জীবনী এমনকি গল্পের কাহিনির মাঝখানেও গল্পের কাহিনি সংগ্রহের ও বিষয় বস্তুকে আহরনের কথা উল্লেখ করেছেন। তাতে এটাই প্রমানিত হয় যে মহাশ্বেতা প্রত্যক্ষ সমাজ থেকেই সুত্র খোঁজেন সাহিত্যের জন্য। আবার সবসময় তা সাহিত্য হয়ে ওঠে বা উঠতে হবে তার জন্যও ভাবিত নন তবে সাহিত্যের শিল্প গুন যদিও খুন্ন হয়, তবে সত্যের মর্যাদা রক্ষিত থাকে। সবই বাস্তব সমাজ থেকে সংগ্রহ করা। এই একই কথা মহাশ্বেতা নিজেও বলেছেন। ‘..... গল্প গুলির অনেক গুলিরই কে, কি, কেন,কবে, কোথায়, বলে দেওয়া যায়।’ এবং তিনি আরও বলেছেন, ‘আমি যে কাহিনি লিখেছি, তার মধ্যে আর যা থাক, যা ঘটেনি তা নেই।’ তাছাড়া মহাশ্বেতার গল্প গুলি পাঠ করলে এই বার্তাই বহন করে নিয়ে আসে, যা বাস্তব সমাজ থেকে সংগ্রহ করা। যুদ্ধ বিগ্রহ, আন্দোলন, প্রতিবাদ, অধিকার আদায়ের লড়াই প্রভৃতি যা বাস্তবে ঘটে আসছে সমাজ ও সংস্কৃতিতে তাই মহাশ্বেতার উপন্যাসের ও ছোটগল্পের মূল বিষয়।

এই শোষণ মূলক রাজনীতির সঙ্গেই জড়িত রয়েছে নারীর জীবন, নারীর শোষণ, নির্যাতন এবং এই শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তৎসঙ্গে নারীর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত অবস্থার পূর্ণ রূপ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। দেখা দেয় উচ্চ শ্রেণি দ্বারা নিম্ন শ্রেণির মানুষদের শোষণের মাত্রার সঙ্গে নিম্ন শ্রেণির নারীরাও জড়িয়ে পরে। আবার পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার শোষণ মূলক রাজনীতির দ্বারা সম শ্রেণির পুরুষদের দ্বারাও শোষিত ও নির্যাতীত হতে থাকে নারী সম্প্রদায়। তবে আভিজাত্য শ্রেণির দ্বারা নারী শোষণ ও নির্যাতন সর্বাধিক ভয়াবহ বার্তা বহন করে নিয়ে আসে। কেননা এই উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষেরা বলপূর্বক ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা নিম্নশ্রেণির নারীদের শোষণ, শাসন ও নির্যাতনকে স্পষ্টভাবে লক্ষকরা যায় মহাশ্বেতার গল্পবিশ্বে। আবার নারী যেহেতু ধীরে ধীরে এই

বৈষম্যময় বিশ্বে নিজের স্থান ও প্রকৃত জায়গাটিকে চিনতে, বুজতে ও জানতে শিখেছে তাই নারীরাও তাদের প্রতি হওয়া নির্যাতন ও শোষণের এবং সাংস্কৃতিক রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। প্রত্যক্ষ ভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমে পরেছে। আবার এই প্রতিবাদ কখনো কখনো পরোক্ষভাবেও উচ্চারিত হয়েছে নিরুচ্চার ভাবে। কোন কোন গল্পে নির্যাতন, শোষণ, শাসন আছে অথচ আপাত দৃষ্টিতে কোন প্রতিবাদ আছে বলে মনে হয় না সেখানেও লেখিকা নিজস্ব অভিব্যক্তির মধ্যদিয়েও প্রতিবাদ নির্মান করেছেন। কোথাও কোথাও নারী বুঝতেও পারেনি যে, তার আচরন ও বক্তব্যের মধ্যেও প্রতিবাদ নির্মিত হয়েছে। যেমন 'বাঁয়েন' গল্পের চন্ডী দাসী পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক রাজনীতির মাত্রাতিরিক্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোন প্রতিবাদ করেনি। অথচ বাঁয়েন নামক যে কুসংস্কারকে পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার গোড়ামীকে যে সমাজ আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে রাখে তাদের ভ্রান্তিকে দেখিয়ে দেয়। তাদের নিজস্ব মতামতের পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে লেখিকা এখানে প্রতিবাদকে প্রতিধ্বনিত করে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। যে সমাজ চন্ডীকে বাঁয়েন বলে, রাক্ষসী বলে সে বাঁয়েনই শত শত মানুষের প্রান রক্ষা করে দুর্ঘটনার হাত থেকে নিজের জীবনের বিনিময়ে। সমাজের মঙ্গলের জন্য যে নারী নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেয় সে সমাজের অমঙ্গল করতে পারে না এই ভাবনাই ভাবোইত করে তুলে গোটা সমাজের মানুষকে। তাইতো চন্ডীর মৃত্যুতে গ্রামের সকল মানুষই মর্মাহত হয় এবং মৃত চন্ডী (বাঁয়েনই) গ্রামের সকল মানুষের আপ্তীয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ মহাশ্বেতা চন্ডীর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সকল সমাজের সমস্ত মানুষদের জানিয়ে দিয়েছেন যে নারীরাও রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। তাদেরও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বোধ করুনা মায়া মমতা আছে। এবং সর্বপরি বাঁয়েন প্রথা যে নারী ধ্বংসের পরিকল্পিত এক রীতি সে বিষয়ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই তো চন্ডীর মৃত্যু একদিকে যেমন মানুষকে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে অপরদিকে নারীর অধিকারের প্রতিবাদকেও উজ্জিবিত করে, সকল সমাজের সকল নারীর 'বাঁয়েন' নামক অভিশপ্ত প্রথার হাত থেকে মুক্তির কামনায়।

'বাঁয়েন' গল্পে যে রকম পরোক্ষ প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয়। 'শিকার' গল্পে ঠিক এর বিপরীত ধর্মী প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয়। 'শিকার' গল্পে এযাবৎকাল ধরে চলে আসা নারীর

প্রতি অন্যায় অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্ষনের প্রতিবাদ জানায় মেরি। শুধু প্রতিবাদই নয় প্রতিশোধও নেয়।

মেরীর মা ভিকনি, সে ডিক্সন সাহেবের ছেলের পাপের বোঝা নিজের গর্ভে ধারণ করে মেরীর জন্ম দেন। কিন্তু মেরী এই একই পাপের বোঝা বহন করতে অরাজী। অপরাধ করবে ঠিকাদার, জমিদার, জোতদার, মহাজন, আর অপরাধের বোঝা বহন করবে নিরোপরাধী অন্ত্যজ শ্রেণির দরিদ্র ঘরের সুন্দরী যুবতী মেয়েরা। ধারাবাহিক ভাবে চলে আসা ক্ষমতার এই রীতি জানতে পারে মেরী তাইতো সে তসিলদারকে সুকৌশলে নিরালায় নিয়ে গিয়ে খুন করে এবং নিজের প্রনয় জালিমের কাছে ছুটে যায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এযাবৎকাল নারী শোষিত, নির্যাতীত, ধর্ষিত, লাঞ্ছিত হয়ে আসছে, সমাজ ব্যবস্থায় যে নারীর কোন মর্যাদা নেই, সেই নারী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বোধে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। স্বার্থপর শাসন ব্যবস্থার সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করেছে মেরী। নিজের প্রতি হওয়া অন্যায়ের শাস্তি নিজেই দিয়েছে তসিলদারকে। কেননা মেরী জানে ক্ষমতাবান অর্থ সম্পত্তি থাকা উচ্চ শ্রেণির মানুষের অপরাধের শাস্তি সমাজ, অফিস, আদালত কোন বিচার ব্যবস্থাই দিতে পারেনা। অর্থ ও ক্ষমতার দাপটে মুক্তি পেয়ে যায়। তাই তো সমস্ত আইন কানুন, সংবিধান , বিচার ব্যবস্থার কোন ধার ধারেনা মেরী। সমস্ত বিচার ব্যবস্থার উর্ধে উঠে নিজেই শাস্তি দেয় তসিলদারকে নিজের ব্যক্তিগত আদালতে।

আবার ‘সতী রানীর ঘাট’ গল্পে নারীর প্রতি হওয়া নিসংস এক নিয়ম ‘সতীদাহ’ প্রথার বিরুদ্ধে নিরুচ্চার অথচ স্পষ্ট প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয় সতীর মধ্যদিয়ে। পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি বিধানকে ভঙ্গ করার এবং অস্বীকার করার মধ্যদিয়ে প্রতিবাদকেই মহিমান্বিত করে তুলেছেন মহাশ্বেতা। জমিদারী পুরুষ তান্ত্রিক শাসনের ক্ষমতা বা প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবাদ করতে না পারলেও ভবানীর সঙ্গে রাতের আধারে গোপনে মিলন ও নীরবে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার মধ্যদিয়ে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদই প্রকাশিত হয়। যদিও সতীরানী সমাজের ধর্মিয় গ্যাড়াকলে নিজেকে আত্মহুতি দিতে বাধ্য হয়। তবুও জমিদার রুদ্র প্রতাপের চিতার

আগুনে সহমরনে যেতে অস্বীকার করার মধ্যদিয়ে মহাশ্বেতা নারীর হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা নিজের স্বাধীন চিন্তাকেই প্রতিধ্বনিত করে তুলেছেন প্রতিবাদী আচরনের মধ্যদিয়ে।

'দৌলতি' গল্পে সাধারণ দৃষ্টিকোনেতাকালে এই গল্পে কোন প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু দৌলতির ধর্ষিত দেহ, রোগ এবং শেষ অব্দি মৃত্যু বরণ এ সবকিছু মিলিয়ে কেমন যেন এক ব্যঞ্জনা ধর্মি প্রতিবাদের গঞ্জনা ধর্মি নীরব ও স্থির ভাষা ফল্গু ধারার মতো বহন হতে থাকে হৃদয়ের অন্তস্থলে। দৌলতির মৃত্যু বর্ণনা এরকম,

> 'আসমুদ্র হিমাচল ভারত উপদ্বীপের সব টুকু জুড়ে হাত পা চিতিয়ে পরে আছে বন্ডেড লেবার, কামিয়া রেন্ডি দৌলতি নাগেসিয়ার নির্যাতীতা, যৌন ব্যধি গলিত শব, ঝাজরা ফুঁসফুঁসের সবটুকু রক্ত বমি করে।'[২১]

গোটা ভারতবর্ষের ম্যাপের উপর দৌলতির দেহের বর্ণনার মধ্যদিয়ে গোটা ভারতবর্ষের মূল চেহাড়াটাকেই যেন দেখিয়ে দিয়েছেন লেখিকা দৌলতির পচাগলা দেহের মধ্যদিয়ে। পাশাপাশি গোটা ভারতবর্ষেই নারীর প্রকৃত অবস্থা যে দৌলতির মতোই পচা পন্যে পরিনত হয়েছে সে বার্তাই যেন নীরবতা, সূক্ষ্মতা ও গভীর ভাবনার মধ্যদিয়ে পাঠক বর্গের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

এভাবেই মহাশ্বেতার গল্পবিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মি নারীর প্রতিবাদিনী সত্তার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবাদের মাধ্যম গুলিকে তাৎপর্যময় করে তুলেছেন। কোথাও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোথাও নির্যাতনের বিরুদ্ধে, কোথাও ধর্ষনের বিরুদ্ধে কোথাও অভাবের বিরুদ্ধে, কোথাও শোষণের বিরুদ্ধে কোথাও বা সম্পত্তির প্রয়োজনে প্রতিবাদই প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে মহাশ্বেতার গল্পবিশ্বে। বস্তুত লেখিকা যে ইতিহাস গড়ার লক্ষে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, যে ইতিহাসে উঠে আসে, 'The voiceless section of Indoian society'র কথা, সে

ইতিহাসেই উঠে আসে নারীর কথা। কারন নারীদের তো চিরকাল কণ্ঠ রুদ্ধ করে রাখাই পিতৃতন্ত্রের নিয়ম। তবে পরিস্থিতির চাপে সত্যই চেনা রূপকে বদলে দেয়। নারীর ক্ষেত্রেও তা একই রকম ভাবে প্রযোজ্য। তাই তারাও কখনো কখনো নিজস্ব রীতিতে প্রতিবাদ করতে জানে এবং প্রতিবাদ করে মহাশ্বেতার গল্পে তারও স্বল্প ইঙ্গিত রয়েছে। এই নারীরা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্ধি হয়েই জীবনযাপন করে না, সময়, সমাজ, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে স্বশরীরে এবং স্বমহিমায় উঠে আসে মহাশ্বেতার নারী চরিত্ররা তাঁর ইতিহাসে। প্রয়োজনে সংঘাতেও নেমে পরে এবং এই প্রতিবাদ, আন্দোলন এবং সংঘাত ততোদিন পর্যন্তই বহাল থাকে যতদিন পর্যন্ত তাদের মৌলিক অধিকার পূর্ণাকারে আয়ত্তে আসে। এই বার্তাই বহন করে চলে মহাশ্বেতার নারী সমাজ। নারীর নিজস্ব ব্যক্তি মর্যাদা, মৌলিক অধিকার, সমাজ সংস্কৃতিকে পুরুষের সমকক্ষতা অদূর ভবিষ্যতে যে আদায় করে নেবে এই পূর্বাভাসও মহাশ্বেতার আখ্যান বিশ্বে পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে মহাশ্বেতার নিজস্ব বাচনেই বলা যায় যে,

> “.....বেশ বুঝতে পারছি যশোদা, দ্রৌপদী, দুলন, বুলাকি এবং অন্যান্য চরিত্ররা আজকের প্রেক্ষিতে ফিরে আসতে চাইছে। করাঘাত শুনি মনে! দরজা খুলে দিতেই হবে।”[২২]

তথ্য সূত্র

১. শিল্প ও সাহিত্য, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-২০০৯, পৃ-১০৯

২. অগ্নিগর্ভ, ভূমিকাংশ,

৩. গল্প সরণি, ষোড়ষ বর্ষ, বার্ষিক শংকলন, ১৪১৮, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, পৃ-৩০৪

৪. মহাশ্বেতা দেবী, এক অকথিত জীবন ও দর্শন নিয়ে আলাপ চারিতায়, কল্যান মিত্র, পৃ-১৬

৫. 'প্রশংসা বা প্রচারে বিশ্বাসী নই' মহাশ্বেতা দেবীর সাক্ষাৎকার, অমর মিত্র, পৃ-৯১, শিল্প সাহিত্য, মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-২০০৯

৬. মহাশ্বেতা শ্রেষ্ঠগল্প, অজয় গুপ্ত, ভূমিকাংশ, দে'জ পাবলিশিং, পৃ-১১

৭. রচনা সমগ্র, ২য় খন্ড, অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং পৃ-৫৪৩

৮. মহাশ্বেতা নারীপরিসর ও অন্যান্য, রামী চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ-৮৭

৯. রচনা সমগ্র, ২য় খন্ড, মহাশ্বেতার ১ম পাঠের সাহিত্য ভাবনা, পৃ-৯

১০. মহাশ্বেতা নারী পরিসর ও অন্যান্য, রামী চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ-৮৭

১১. রচনা সমগ্র, ৬ষ্ঠ খন্ড, মহাশ্বেতার ১ম পাঠের সাহিত্য ভাবনা, পৃ-৪৯১

১২. মহাশ্বেতা নারী পরিসর ও অন্যান্য, রামী চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ-৮৮

১৩. শিল্প ও সাহিত্য, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-২০০৯, পৃ-১০৯

১৪. মহাশ্বেতা নারী পরিসর ও অন্যান্য, রামী চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ-৮৮

১৫. শিল্প ও সাহিত্য, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-২০০৯, পৃ-১০৯

১৬. মহাশ্বেতা নারী পরিসর ও অন্যান্য, রামী চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ-৮২

১৭. শিল্প ও সাহিত্য, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-২০০৯, পৃ-১০৯

১৮. শ্রেষ্ঠগল্প, মহাশ্বেতা দেবী, দে'জ পাবলিশিং, পৃ-১১

১৯. রচনা সমগ্র, ৯ম খন্ড, মহাশ্বেতার ১ম পাঠের সাহিত্য ভাবনা, পৃ-৫৫৬

২০. শ্রেষ্ঠগল্প, মহাশ্বেতা দেবী, দে'জ পাবলিশিং, ভূমিকাংশ, পৃ-১১-১২

২১. রচনা সমগ্র, ১৩তম খন্ড, মহাশ্বেতার ১ম পাঠের সাহিত্য ভাবনা, পৃ-৩৭৯

২২. শ্রেষ্ঠগল্প, মহাশ্বেতা দেবী, দে'জ পাবলিশিং, ভূমিকাংশ, পৃ-১৩

উপসংহার